(রূপকথা)

ভেল্কী প্রণেতা

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপালি—১৩৩৭

দাম বারো আনা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা।

প্রিণ্টার :—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১৫।২, ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা।

মাসপয়লা সম্পাদক প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিক সুহৃদ বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উৎসাহ ও তাড়াতেই শুক-শারী লিখা।

এর প্রায় সব ক'টা গল্পই মাসপয়লায় প্রকাশিত হয়েছিল, কেবল মাত্র শেষ গল্পটি বার্ষিক শিশুসাথীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

লেখাগুলি অনেককাল পড়েছিল। ক্ষিতীশবাবুর আগ্রহেই আজ আবার তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো।

এজন্য তাঁকে আর প্রকাশক মহাশয়কে আমার অন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বইখানা পড়ে ছেলেমেয়েরা যদি খুসী হয়, তবে—তা' উপরি পাওনা বলেই মনে করবো।

দীপালি—১৩৩৭
নবদ্বীপ

—লেখক
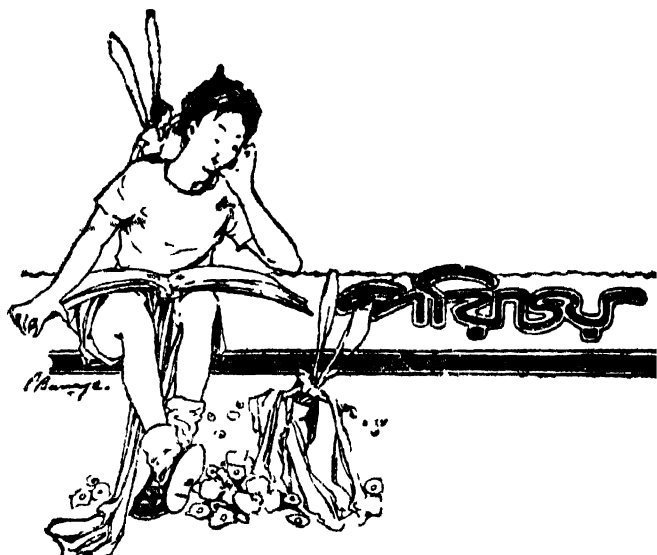
স্নেহভাজন

শ্রীমান্ চিনু ও কানুর

হাতে

—মেজ মামা

পরিচয়

আজি কালে কোন সে যুগে রাজার ঝিয়ারি,
ঘুঁটে কুড়োয় চোখের জলে পরাণ বিদারী---।
কোন দাসী গো পাট-রাণী হয়, কোন রাণীমার দুখ,
চোখ দুটো তার উপড়ে নিয়ে কাহার হোল সুখ!
রাজার ছেলে কোথায় গেল, তেপান্তরের মাঠে,
কোন রাজ্যে খোঁজাখুঁজি ডঙ্কা-পিটে বাটে?

*　　　　*　　　　*

*　　　　*

হীরের ঝালর দুলিয়ে ডুলি বউ আনে সে রাজকুমার,
কোন রাণীমা দেয় সে এঁকে উল্লাসে হায় চাপ্-চুমার।
গজমোতির আলোয় কোথায় পাতালপুরী উদ্ভাসী,
ঘুমিয়ে পড়া রাজকুমারীর দেয় পাহারা রাক্ষসী।
জিওন-কাঠি মরন কাঠি, দুইপাশে তার পড়েই রয়, --
আসবে কবে রাজপুত্তুর,---কিম্বা আসা নাই-বা হয়!

কে জানে গো—কে জানে গো,—ভাব্না ভেবে মুখ ভারি,
"আর কেউ নয়, আমরা জানি, কয় যে ডাকি 'শুক-শারী'।"

এক

ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত আকাশ থেকে জ্যোস্না গলে' গলে' ঝরে পড়্ছে বাতাসে ফুলের সৌরভ—লুটে'পুটি খায়, কোকিল গলা ফাটিয়ে কু কু করে, এমনি এক রাতে বিরাট শোভাযাত্রা কোরে বর বিয়ে কোর্তে চলেছে,—কোন দেশে, কোন গাঁয়ে, কার ঘরে ?—কে জানে !

লোক লস্কর হাতি ঘোড়া পাল্কী তাঞ্জাম ময়ুর পঙ্খি যে কত গেল তার ইয়ত্তা হয়না। সারি সারি লোক চলেছে, তার আর শেষ নেই, রংমশাল আর আলোর ঝিলিক, ফুলঝুরির ফিনকি রাতের আকাশ রঙ্গিয়ে তুলেছে।

বাজনা বাজছিল "ঝমর্ ঝমর্" বাঁশীতে আগমনীর তান ধরেছে, তারা চল্ছিল সারা রাস্তায় ফুল ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

আশপাশের গাঁ উজাড় কোরে লোক ভাঙ্গ্‌ল— তামাসা দেখ্‌তে, কেউ বল্লে—"হয়ত কোন ধনী লোক হবে।" কেউ বল্লে, "হয়ত বা কোন দেশের রাজা উজীর।"

শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে চলে গেল। গাঁয়ের লোক যারা ছুটে এসেছিল সবাই ফিরে গেল, কেউবা সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর পর্য্যন্ত গেল।

বাঁশীর সুর বাতাসে মিলিয়ে গেল, আলোর ঝিলিমিলি অন্ধকারে ডুবে গেল, শোভাযাত্রী হয়ত অনেক দূর চলে গিয়েছে।

গাছের ডালে বসেছিল শুক-শারী। এতবড় একটা বিরাট শোভাযাত্রা তাদের ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেছে, এতে শুকের হল ভারি রাগ। শুক বল্লে, "শারী এরা কারা গো?" শারী কোন উত্তর দিলে না, শুধু ফঁস্‌ কোরে নিশ্বাস ফেল্ল।

শুক বল্লে, "যে-ই হোক এরা, যেমন হাস্‌তে হাস্‌তে যাচ্ছে, তেমনি যেন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফেরে

শারী করুণ সুরে বলে উঠ্‌ল, ছি ছি কি বল্লে!

শুক ডানা দুটো একটু ঝেড়ে নিয়ে গায়ের পালকগুলো ফুলিয়ে ভাল হোয়ে বসে উত্তর দিল কেন?

শারী জবাব দিল, আজ নয়, আর একদিন বলব।

* * *

পনোর দিন পরে আবার এক তেমনি রাত এলো—তাতে না আছে চাঁদের হাসি, না আছে কিছু।

কোকিলগুলো হঠাৎ কোথায় যেন স'রে পড়েছে, ফুল ফোটে কিন্তু বাতাস নেই—তাই সে সে গন্ধ ছড়াতে পারে না, গুম্‌টো গরমে যেন পৃথিবী জবুথবু হোয়ে বসে রয়েছে।

বোধহয় সেই তারাই ফিরে আস্‌ছে। পঙ্গপালের মত লোকের সারি। সঙ্গে তাদের না আছে তেমন আলোর বাহার, না আছে বাঁশীর মোহন

তান। বাজনা নেই, আলো নেই, এমন কি এত যে লোক কারু মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নেই।

অন্ধকারে পথ চেনা যায় না, তাই তারা কুপথ সুপথ কিছুই ঠিক পায়নি, যে যেখান দিয়ে পারে, সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের পায়ের চাপে উঁচু ভুঁই নীচু হোয়ে গেল। ঝুম্‌কো লতা, রজনী গন্ধার ঝাড় ঘাড় ভেঙ্গে মাটিতে ভেঙ্গে পড়্‌ল বুল্‌বুলি টুনটুনি দোয়েল শ্যামা বাসা হারাল। এ ছাড়া আরও যে কত ক্ষতি হোল কে তার খবর রাখে ?

এমনি উৎপাতে আবার শুক-শারীর ঘুম ভাঙ্গল।—

শুক রেগে শারীকে জিজ্ঞাসা করিল।

"শারী এরা কে গো—?"

শারী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—"যাদের তুমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরতে বলেছিলে তারাই" শুক জিজ্ঞাসা করিল "কৈ কাঁদ্‌ছে না ত' ?"

মানুষ আবার কাঁদে কি কোরে! দেখ্‌ছ না

সে আলো নেই, সে মশাল নেই, সে বাহার নেই, সে বাজ্‌না নেই”—শুক উত্তর দিল।

'ওদের দুঃখটা কি—”

চাঁদপানা হায় রাজপুত্তুর শান্ত অতি ধীর।
ঢালের মতন বুক খানা তার দিগ্বিজয়ী বীর॥

তারপর, শারী চোখের জল মুছে বল্‌ল,—সেই রাজপুত্তুর যাকে বিয়ে কোরে ফিরেছে সে এক রাজকন্যে।—রাজকন্যের সব ভাল তবে একটা খুঁৎ। বিয়ের আগে কেউ জান্‌তনা—বিয়ের পরে যখন সেটা প্রকাশ হোয়ে পড়্‌ল তখন রাগে দুঃখে বর পক্ষ ঠিক কোর্‌ল ঘরে ফেরার পথে শোভাযাত্রা হবেনা, আলো জ্বাল্‌বে না—বাঁশী বাজ্‌বেনা!

শুক বল্লে শারী রাজকন্যের খুঁৎটা কি তার কি রূপ নেই?

শারী উত্তর দিল—রূপ নেই বল কি?

চাঁপা হেন গায়ের বরণ মেঘ ডম্বুর চুল।
গাল দুটী তার থল্‌পদ্ম ঠোঁটটি ডালিম ফুল॥

মুক্তা হেন দন্ত পাটি মৃণাল বাহু দুটী।
মরাল গতি ধায় সে যবে দুলিয়ে ক্ষীণ কটি ॥
চরণঘাতে কমল ফোটে, তিলফুলি সে নাসা।
ভুরু যেন ইন্দ্রধনু ভোমরা আঁখি খাসা ॥

শুক জিজ্ঞাসা কোরল তবে?—তবে বুঝি তার কোনই গুণ নেই—কেবল রূপই সার?

শারী বল্লে না,—তাও নয়—

ধীর বিনয়ী লক্ষ্মীসমা নাই'কো তুলনা
বাগ্‌দেবী তার কণ্ঠে রাজে সুধার ঝরনা ॥

শুক ভারি বিপদে পড়ল, বল্‌ল—"তবে কি। শারী, আমায় খুলে বলনা!"

শারী উত্তর দিল,—কাল আমরা রাজপুত্তুরদের দেশে যাত্রা কোরব, সেখানে তোমার অনেক কাজ —কাজ না ফুরুলে সব কথা তোমায় খুলে বল্‌ব না, মাত্তর আর একদণ্ড রাত্তির আছে এখন ঘুমোও।

শুক বলে "সে কোন বিদেশ বিভুঁই যায়গা,

—কাজ কি শারী আমাদের সেখানে গিয়ে? বেশ ত আছি এখানে।”

শারী বল্লে,—তা হবে না, আমি যাবই।

দুই

পরদিন ভোর হোতেই শুকশারী নতুন দেশের উদ্দেশে যাত্রা কোরল।

তারা কেবল চলেছে—আর চলেছে।

কত নদী, কত বন, কত ছোট বড় মাঠ, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে গেল।

ক্রমাগত উড়্‌তে উড়্‌তে শুক হাঁপিয়ে পড়্‌ল, সে শারীকে বল্লে—শারী একটু জিরিয়ে নিলে হয় না।”

শারী বল্লে—“বর ক’নে রাজ্যে ফির্‌বার আগে আমাদের যাওয়া দরকার ত। দেখি তোমার জ্বালায় আর হয় না,—কত কষ্ট কোরে তাদের ছাড়িয়ে এলাম।”

শুক সে কথা শুনল না ঝুপ্ কোরে একটা তাল গাছের মাথায় বসে পড়্ল বাধ্য হোয়ে শারীও নাম্‌ল কিন্তু সে মুখ ভার কোরে থাক্‌ল।

একদিন পরে আবার তারা যাত্রা কোরল, কিন্তু পথে শুকের কুড়েমীর জন্যে তাদের নুতন রাজ্যে পৌঁছুতে বেশ দেরী হোয়ে গেল, এর মধ্যে বর কনে পৌঁছে গিয়েছে।

নুতন রাজ্যে শুক-শারী এসে দেখে এমন যে সুন্দর রাজ্য তা যেন কেমন মলিন হতশ্রী হোয়ে রয়েছে। লোক জনের মুখে হাসি নেই, গান নেই, উৎসাহ নেই। এমন যে ছবির মতন রাজপুরী তাতে না জ্বলে বাতি, না নহবতে বাজে বাঁশী। এত যে তোরণ দ্বার তাতে না আছে ফুলের সজ্জা না, আছে পাতার বাহার। শুধু প্রহরী গুলো ঢাল তরোয়াল নিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শুক-শারী রাজ প্রাসাদের উপরকার গম্বুজের একটা ঘুল্‌গুলিতে বাসা নিল।

শুক বল্ল "শারী এখন বল কি কোর্‌তে হবে ?"

শারী বল্ল "বলছি—দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই দু'একদিন এদের ভাবগতিক দেখি।"

শুক এ কথায় আর জবাব দিল না শুধু মুখ হাঁড়ি কোরে বসে রইল।

রাতে পৃথিবীর সব্বাই ঘুমুল চারিদিক যখন চুপচাপ হোয়ে এল, তখন শারী শুককে ডেকে বল্লে "কাল তোমাকে কি কোর্‌তে হবে বলি শোন—"

শুক বল্লে কি ?

শারী বলে যেতে লাগ্‌ল...

"রাজকুমার বিয়ে কোরে এনে আর বউ নেয় না। নুতন রাণী থাকেন সেই দেউড়ি পার হোয়ে সেই অন্দর মহলের এক কোণায় আর রাজকুমার থাকেন বারবাড়ীতে।

নুতন রাণী যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে বহু পুরাকালের একটা বড় কাঠের সিন্দুক আছে তার ভেতরে আছে—হীরে-জহরৎ, মণি-মাণিক্য, সোনা-

দানা আরও কত কি। এই মনি-মাণিক্যে পাহারা দেয় এক থুথ্থুড়ে বুড়ী। বুড়ীর বয়স অনেক, তার গায়ের হল্‌দে চাম্‌ড়া ঝুলে হাওয়ায় দোল্‌ খায়, মাথার পাকা চুল সব উঠে গিয়ে এখন একদম ন্যাড়া! গায়ের সমস্ত হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে, একটু নড়া চড়া কোর্‌লেই হড়মড় কোরে শব্দ করে। বুড়ীর সারা গা গহনায় মোড়া—কুঁজো হয়ে হাঁটে। বুড়ী সেই সিন্দুকটির কাছে চুপটি কোরে একখানা দর্পন নিয়ে বসে থাকে চারিদিকে দর্পন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে কে আস্‌ছে যাচ্ছে! বুড়ীর যে এত বয়স তা সত্বেও চোখের দৃষ্টি খুব। শুক জিজ্ঞাসা কোরল "বল কি!"

শারী বল্লে "হ্যাঁ তাই, বুড়ী ছিল এক গরীব ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়ে।—সুন্দরী ছিল তাই বুড়ো রাজা তাকে বিয়ে কোরে আন্‌ল।

রাণীর পাটে বসেই ঘুঁটে কুড়ুনীর মেয়ে হীরে জহরৎ গয়না গাঁটী পেয়ে পাগল হয়ে উঠ্‌ল

আর তাই নিয়েই দিন রাত মেতে রইল। দিন
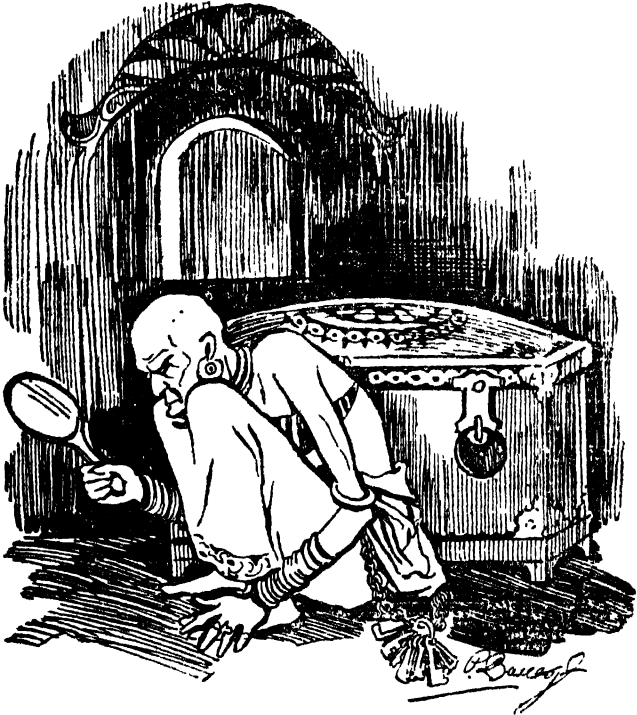
দিন নূতন নূতন গয়না গড়িয়ে আসে—রাণী তাই

পরে আর খোলে—এমনি করে দিন কাটে। কালে সব্বাই এক এক কোরে মরে গেল— বড় রাণীমা মরে গেল—বুড়ো রাজা মরে গেল— বুড়ীর আর মরণ হয় না! বিধবা হোয়ে গয়নার শোকে বুড়ী পাগল হোল—সেই থেকে ও সিন্দুকের কাছে বসে দিনরাত পাহারা দেয় আর নিজের খেয়াল মত গহনা পরে আর খোলে—পাগল বলে কেউ বুড়ীর সঙ্গে কথা বলে না। সেই ঘরে— একটা হাতীর দাঁতের খাটে রাজকুমারের নুতন বউ থাকে। বউটা এসে অবধি কাঁদে আর কাঁদে —বুড়ী তাকে থেকে থেকে তাড়া দেয় আর কোমরের সোনার চেনে গাঁথা মস্ত মস্ত চাবির গোছা গুলো মেঝেতে আপ্‌শে আপ্‌শে ভয় দেখায়।”

শুক অবাক হোয়ে সব শুনে বল্লে—“তা— যেন হোল শারী—এখন কি মতলব ঠাউরেছ বলদিকিনি ?

শারী বল্লে—তোমাকে আর আমাকে সেই ঘরে গিয়ে দুটী কাজ কোর'তে হবে।

তুমি সেই কাঠের সিন্দুকটার পাশে বসে কুটুর্ কুটুর্ কোরে কাট্‌বে।

শুক বল্লে···আর তুমি ?"

—আর আমি রাজকুমারীর কানে কানে দুটো কথা বল্‌ব। আমি—আগে ঘরে ঢুক্‌ব, তার দুদণ্ড পরে তুমি যাবে। আমি রাজকুমারীকে সমস্ত খুলে বল্‌ব তাকে কাঁদ্‌তে মানা কোরব।

শুক জিজ্ঞাসা কোরল—কাঠের সিন্দুক কেটে কি হবে ?

সিন্দুক কাট্‌তে দেখ্‌লেই বুড়ী তোমাকে তাড়া কোরে আস্‌বে—তার হাতের দর্পণ ফেলে, সেই ফাঁকে আমি সেটা চুরি-কোরে রাজকুমারীকে দেব। বুড়ীর, চারপাশে একটা গণ্ডী টানা আছে তার বাইরে দর্পণ গেলে বুড়ী আর চোখে কিছু দেখ্‌তে পাবে না, একদম অন্ধ হোয়ে যাবে।

অন্ধ হোয়ে বুড়ী শোকে আর বেশীক্ষণ বাঁচবে না। এই হোলেই তোমার কাজ ফুরুল।

শুক ফিস্ ফিস্ কোরে বল্লে···দর্পণ দিয়ে কি হবে শারী?

শারী হেসে বল্লে···সেইটেইত তুমি জান না—তবে বলি শোন···

রাজকুমারী চন্দ্রাবতীর চক্ষু দুটী ভারি চমৎকার, এমন চমৎকার চোখ্ দুটী বুঝি আর নেই, পদ্মের পাঁপড়ির ওপর ভোমরা বস্‌লে···যেমনটি দেখায় ঠিক তেমনি, চোখের নীচে হরিণের চোখের মতন কাজল পরা'ন চোখের তারাটি যেন ঠিক একটি নিলকান্তমণি, কিন্তু এত থেকেও কিছুই নেই—হায় রে—সে চোখে দৃষ্টি নেই। রাজকুমারী চেয়ে থাকে—শুধু পাথরের মত, তাতে কোন ভাষা ফুটে ওঠে না—তার কাছে আলো অন্ধকার সব সমান। এই দোষে আজ তার এত দুঃখ, আমি তার সেই দুঃখ দূর করবো।

সব শুনে শুক বল্লে···কিন্তু রাজকুমারকে কি কোরে অন্দর মহলে নিয়ে আস্‌বে? সে-ত পণ কোরে বসে আসে!

শারী বল্লে···সেটা ত তুমিই ভাল জান, তুমি বুদ্ধি ঠাওরাও।

শুক বল্লে—তবে বলি শোন, রাজকুমার মৃগাঙ্ক খুব পাখী ভালবাসে, আমি তাকে ভুলিয়ে যেমন কোরে পারি রাজকন্যের ঘরের ভেতর এনে জান্‌লা দিয়ে পালিয়ে যাব। তাই ঠিক হোল।

* * *

পরদিন শারীর মত্‌লব মত শুক কাঠের সিন্দুক যেমনি কুটুর কুটুর কোরে কাটতে গেল অম্‌নি সাত তাড়াতাড়ি হাতের দর্পণ ফেলে বুড়ী "হেই··· হেই" কোরে মার্‌তে ছুটে এল, এই ফাঁকে শারী দর্পণখানা তুলে নিয়ে তা রাজকুমারী চন্দ্রাবতীর হাতে দিল অমনি তার চোখের দৃষ্টি ফিরে এল। হঠাৎ নূতন আলো দেখ্‌তে পেয়ে রাজ-

কুমারী আনন্দে বিস্ময়ে থ' হোয়ে গেল শুধু সে বল্লে ..."এত সুন্দর তোমাদের পৃথিবী ?"

শারী বল্লে..."হ্যাঁ এত সুন্দর—কিন্তু একটা একটা কথা বলে যাই,—দর্পণ কখনও হাত ছাড়া কোর না, রাতদিন আঁচলে বেঁধে রেখ।" এই বলে শারী ফুড়ুৎ কোরে দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল। চন্দ্রাবতী কি যেন শারীকে বল্‌তে যাবে এই ঠিক কোরে যেই তার পেছনে পেছনে এগিয়ে যাওয়া ঠিক সেই সময়—রাজকুমার মৃগাঙ্ক শুকের পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকেই সামনে চন্দ্রাবতীকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

চন্দ্রাবতী বল্লে,—"তুমি কে আমি জানি নে। —যে-ই হও আমাকে ঐ পাখীটা ধরে দেবে ?"

রাজকুমার মৃগাঙ্ক, অবাক হোয়ে রাজকুমারীর দিকে চেয়ে রইল। রাজকুমারী লজ্জায় লাল গোলাপ ফুলটির মত ঘাড় নীঁচু কোরল।

———

[১]
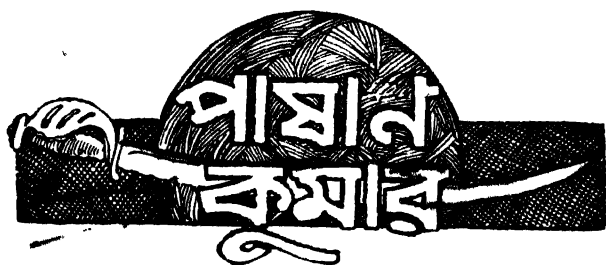
ভারি অবাধ্য ! রাজকুমারের মতি-বুদ্ধি মোটেই ভাল নয়—ভেবে ভেবে রাজার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

বংশের একমাত্র ছেলে, তার উপর ভবিষ্যতে দেশের ও দশের আশাস্থল ; রাজা ভাবেন—এমন ছেলে না থাকাই ভাল। রাণী-মা ভাবেন—বড় হলেই বুদ্ধিসুদ্ধি হবে। প্রজারা ভাবে—কোন্ দিন বা বিনি-দোষেই গর্দানটা যায় ! রাজকুমার—নিষ্ঠুর নিতান্ত পাষাণ !

বাস্তবিক রাজকুমারের খেয়ালের অন্ত ছিল না—, আর সেগুলো এমনি উৎকট যা ভূভারতে কেউ কল্পনায়ও আন্‌তে পারে না। তাই লোকে বল্‌ত "পাষাণ কুমার"। রাজকুমারের নাম ছিল চিত্তজিৎ। কিন্তু কোন কালেই কেউ তাঁকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না—তাই তাঁর নামটা যেন তাঁকে ব্যঙ্গ কর্‌ত।

চিত্তজিৎ জন্মে ছিল অসামান্য রূপরাশি নিয়ে। লোকে অবাক হয়ে ভাবত, "পুরুষ মানুষের আবার এতরূপ হয়?"—তাঁর চেহারার এমনিই গুণ ছিল যে লোকে দেখ্‌লেই মুগ্ধ হয়ে যেত, কিন্তু তাঁর ব্যবহার দেখ্‌লে আরও বেশী বিস্মিত হত—"যার বাহিরটা এত কোমল—তার ভেতরটা পাষাণের চেয়ে শক্ত হয় কি ক'রে?"

* *

*

সেদিন এমনই আকাশ জুড়ে ঘনঘটায় মেঘ

করে এসেছিল—টিপ্‌টিপে বৃষ্টি, দম্‌কা হাওয়া, সবটা মিলিয়ে যেন মনে হচ্ছিল পৃথিবীর বুকে একটা তাণ্ডব নৃত্য সুরু হবে। এমন দিনে কেউ ঘরের বার হয় না—

রাজকুমার চিত্তজিৎ বলে মৃগয়ায় যাব। শুনে সকলেই অবাক্!—সে কি!! এই দুর্য্যোগ—তার ওপর এমনি দিনে কি শীকার মেলে?

রাণী-মা বল্লেন—ছিঃ পাগ্‌লামি করিস্‌নে চিত্ত, তোর কি বুদ্ধিসুদ্ধি একটুও হবে না কোন কালে?

চিত্তজিৎ বল্লে—"আমার সুখ কর্ব্বার সময় কৈ মা—, রাজার ছেলের জীবন ত দুর্য্যোগেই ভরা—!" রাণী-মা অতশত বুঝলেন না, ভাবলেন—"মাথা খারাপ" তাই তিনি ছুটে গেলেন রাজার কাছে—যাতে মৃগয়ায় যাওয়া না হয়। সব শুনে রাজা থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন,—মুখ দিয়ে একটি কথাও ফুটল না।

রাজা বল্লেন—এই দুর্য্যোগে মৃগয়ায় যেও না।

চিত্তজিৎ বল্লে—যা অসম্ভব তাই সম্ভব করাই ত রাজার কাজ !

মন্ত্রী বল্লেন—ছিঃ অবাধ্য হয়ো না,—তুমি নিতান্ত খেয়ালী হচ্চো দিন দিন !

চিত্তজিৎ রুক্ষস্বরে বল্লে—রাজা-রাজড়াইত খেয়ালী হয়। চিত্তজিৎ চলে গেল। রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই চিত্তজিতের ব্যবহারে স্তম্ভিত হলেন—রাজা ক্রোধে নিজের কটিদেশ থেকে তরবারি খুলে ছুটে চল্লেন—চিত্তজিতের সন্ধানে—।

মন্ত্রী বল্লেন—সে কি মহারাজ !

রাজা উন্মত্তের মত চীৎকার করে বল্লেন—চিত্তজিতের স্পর্দ্ধার শেষ সীমানা চিরদিনের মত নির্দ্দেশ করে দেবো।

রাজা বের হয়ে যাবেন এমন সময় একজন অতি বৃদ্ধ শীর্ণদেহ ব্রাহ্মণের হাত তাঁর গতিরোধ করল—রাজা চেয়ে দেখলেন—রাজগুরু।

রাজগুরু বল্লেন—মহারাজ ক্ষান্ত হন।

*　　*

*

চিত্তজিৎ কারুরই বাঁধা শুনল না—ঘোড়া ছুটিয়ে তীর বল্লম ঘাড়ে ক'রে বেরিয়ে পড়ল—পেছনে পেছনে সৈন্য সামন্ত ছুট্‌ল।

রাণী-মা রাজপুরীর গবাক্ষের হীরের ঝালরের পর্দ্দা সরিয়ে—চুপটি ক'রে বসে থাক্‌লেন—আর কাঁদতে লাগলেন।

[২]

সমস্তটা দিন হয়রাণ হয়ে খোঁজাখুঁজি করে—শীকার কিছুই মিল্‌ল না। দিন পড়ে এল। একেত নিবিড় বন—তাতে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। এই অন্ধকারের ভেতর ভাল করে আর পথ দেখা যায় না, চিত্তজিৎ পথ হারাল। সৈন্যসামন্তেরা কে কোথায় আছে তারও ঠিক ঠিকানা নেই এমন সময় আকাশ ভেঙ্গে মুষল ধারে বৃষ্টি নামল।

চিত্তজিৎ সেই নিবিড় বনের ভেতর সূচীভেদ্য অন্ধকারে ঘোড়ার পিঠের উপর বসে বসে ভিজতে লাগলেন। ভাবলেন—কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে হয়ত সৈন্যসামন্তরা খুঁজতে খুঁজতে এই পথে এসে পড়তে পারে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। উপরে নিবিড় মেঘের গুরু গর্জ্জন তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি—নীচে রাত্রের গাঢ় অন্ধকার তাতে আবার ঘোর জঙ্গল।

চিত্তজিৎ ক্রমেই শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। বারে বারে শিঙা বাজিয়ে সঙ্কেত করলেন, কিন্তু সঙ্গীদের কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না—এই সময় সমস্ত আকাশ-মণ্ডল কিরণচ্ছটায় ভরিয়ে দিয়ে ভীষণ হুঙ্কারে কোথায় যেন পৃথিবীর বুকে বাজ পড়ল—সেই শব্দে সমস্ত বন গুম্-গুম্ করে কেঁপে উঠল।

এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডে চিত্তজিৎ নিজকে সামলে নিলেও—ঘোড়া কিছুতেই আর বাগ মানল না—প্রাণপণে ছুট্‌ল। সম্মুখে কোথায় গাছ—কোথায়

বেত বন, কোথায় লতা-মণ্ডপ কোন কিছুরই স্থির

নেই—ঘোড়া প্রাণপণে সম্মুখের দিকে ছুটেছে,

হঠাৎ আবার বিদ্যুৎ চম্‌কালো—আবার কড়কড় শব্দে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে মেঘ গর্জ্জন হল। ঘোড়া ছুটছিল, সেই বিদ্যুতালোকে চিত্তজিৎ দেখলেন সম্মুখে মস্ত এক বিরাট গহ্বর। গহ্বর দেখে হঠাৎ ঘোড়ার গতি রোধ কর্‌বার জন্যে সহসা চিত্তজিৎ প্রাণপণে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন—কিন্তু তখন আর সময় ছিল না—এবং ঘোড়াও আর নিজেকে সামলাতে না পেরে লাফিয়ে উঠে গহ্বরের ভেতরে গিয়ে পড়ল, আর নিমিষের মধ্যে কোথায় যেন তলিয়ে গেল।

[৩]

এক অসীম অন্ধকারময় শূন্যের ভেতর দিয়ে হু হু শব্দে চিত্তজিৎ ঘোড়ার পিঠের ওপর বসে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছিলেন,—সে কোথায়—কোন দিকে? তা কেউ জানে না। চিত্তজিৎ ভয়ে আধমরা হয়ে রইল।

সাত দিন—সাত রাত্রি ক্রমাগত এমনি করে চলার পর বহুদূরে নীচের দিকে একটা আলোর রেখা দেখতে পাওয়া গেল। চিত্তজিতের মনে হল, হয় ত এটা হীরের খনি। তারপর মনে হল, না—বোধ হয় পাতালপুরী! কিন্তু যাই হোক না কেন—ওর উপর গিয়ে পড়লে ত আর রক্ষে নেই! ভয়ে চিত্তজিতের মুখ শুকিয়ে গেল, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু তাঁকে নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌ছিল—চিত্তজিতের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ছিল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমেই আলো প্রখর হয়ে উঠ্‌ল—তারপর আরও বেশী, আরও প্রখর! শেষকালে মনে হল যেন একটা দেশ, এমনি পৃথিবীর মতন ফল-ফুল আলোয় ভরা এমনি চোখ জুড়ানো।

ক্রমে ক্রমে চিত্তজিৎ সে দেশে গিয়ে পড়্‌ল। যেখানে গিয়ে পড়্‌ল সে একটা বিরাট রাজপুরী।

চিত্তজিৎ অবাক্ হয়ে গেল।

চারিদিক থেকে সদ্য ফোটা ফুলের গন্ধে বাতাস

পাগল হয়ে ছুটাছুটি কচ্ছে—সমস্ত পুরীটার ভেতর যেন একটা বিরাট উৎসব চল্‌ছে—তাতে বাজ্‌ছে শুধু ঝুন্‌ ঝুন্‌ করে নূপুর—আর ভেসে আস্‌ছে মিষ্টি গানের সুর।

চিত্তজিৎ মুগ্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সে শ্বেত পাথরের পৈঠের ওপর পা দিল, অমনি মন্ত্রমুগ্ধের মত একসঙ্গে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। চিত্তজিৎ ভাবলে —এ কি অবাক্‌ কাণ্ড! কি জানি কি ভেবে চিত্তজিৎ ধীরে ধীরে সিঁড়ি থেকে পা তুলে নিলে—অম্‌নি আবার গানে দিক্‌ ভরে উঠ্‌ল—নূপুরের শব্দে বাতাস কেঁপে উঠ্‌ল—সুরভি গন্ধ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ল।

চিত্তজিৎ মূঢ়ের মতন ভাবে—একি অদ্ভুত ভূতুড়ে দেশ! অনেকক্ষণ চিত্তজিৎ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে—কোন জন-মানুষের চিহ্ন নেই অথচ এত বড় পুরী, আর ভেতরে উৎসব চল্‌ছে।

চিত্তজিৎ ধীরে ধীরে আবার সিঁড়ির ওপর পা দিয়ে উঠ্‌তেই আবার চারিদিক নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল। যেন সেখানে কোনকালে, কোনদিন খুট্‌ করে শব্দটি পর্য্যন্ত হয় নি—এমনি!

চিত্তজিৎ সাহসে ভর করে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে দালানে উঠ্‌ল। কি সুন্দর সব ঘর—সে কি সুন্দর সাজান—যেন এইমাত্র কে নিপুণ হাতে সাজিয়ে রেখে গেছে। কিন্তু একটা কথা, এর যা কিছু সবই পাথরের, কারুকার্য্য থেকে আরম্ভ করে খাট, চৌকি, বিছানা, বালিশ প্রদীপ, ফুল-পাতা অস্ত্রশস্ত্র সব পাথরের তৈরী। হঠাৎ চিত্তজিতের শরীরটা যেন শিউরে উঠ্‌ল! তাই ত, এ কি যাদু-করের দেশে এসে হাজির হলাম! তারপর ঘরের পর ঘর—চত্তরের পর চত্তর—দেউড়ির পর দেউড়ি—চিত্তজিৎ সব ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াল, কোথাও কোন প্রাণীর সন্ধান মিল্‌ল না। কিন্তু এ ছাড়া আর যা কিছু নজরে এল সবই ঐ পাথরের তৈরী।

হঠাৎ নজরে পড়তেই চিত্তজিৎ দেখতে পেলে, প্রাসাদের ঠিক মাঝখানে একটা গোল উদ্যান— তাতে হরেক রকমের পাথরের গাছ। তাতে পাথরের ছোট্ট ছোট্ট ফুল ধরেছে, আর তারি চারি-পাশ ঘিরে নৃত্য কচ্ছে একদল পাথরের পরী! পাথরের ভেতর দিয়েও তাদের রূপ-লাবণ্য ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল। কিন্তু হায় তাদের প্রাণ কোথায়? তারা বেণী দুলিয়ে, নূপুর পায়ে দিয়ে, ফুল ছড়িয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নাচের ভঙ্গিতে।

চিত্তজিৎ ঘুরে ঘুরে সব পরখ করে দেখ্‌লে। তারপর বুক থেকে বেরিয়ে এল একটা তপ্ত নিঃশ্বাস।

চিত্তজিৎ সেখান থেকে ফির্‌ল। ফিরে প্রাসা-দের সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠে গেল, উপরেও ঠিক সেই রকম, সম্মুখে একটা বিচিত্র কারুকার্য্যময় ঘর দেখে, হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল। সে ঘরটা বোধ-করি প্রাসাদের মধ্যে সব চেয়ে সেরা ঘর। ঘরের

দরজার কাছে দুই প্রকাণ্ড পাথরের অজগর কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথা উঁচু করে রয়েছে, আর তাদের মাথার উপরকার দু' খানা মণি থেকে আলো বের হয়ে সমস্ত জায়গাটা চোখ-ঝল্‌সান আলোতে ছেয়ে ফেলেছে।

ঘরখানা স্ফটিক মর্ম্মরে তৈরী।

সূর্য্যকান্ত মণির একখানা ময়ূরপঙ্খী খাট। সেই খাটের উপর এক পাথরের রাজকুমারী চুপ করে বসে রয়েছে—তার চোখ দিয়ে ধারা নেমেছে—কয়েক ফোঁটা সদ্য মুক্তো।

চিত্তজিৎ অপলক নেত্রে রাজকুমারীর দিকে চেয়ে থাকল। সে কোন শিল্পী—কোন কারিগর এ মূর্ত্তি তৈরী করেছিল। খোদাই করা যন্ত্রের কঠিন আঘাতের ভেতর থেকে এত লাবণ্য এত রূপ কি করে বেরিয়ে এল!

কতক্ষণ চিত্তজিৎ নিস্পন্দের মতন এমনিভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক নেই। চিত্তজিতের বুক থেকে

আবার গভীর তপ্তশ্বাস বেরিয়ে এল। সে ভাব-

পাথরের রাজকুমারী চুপ করে বসে রয়েছে—পৃঃ ২৯

ছিল—সে কোন শিল্পী যে, সবটুকু দিয়ে শেষটায় প্রাণ দিতে ভুলে গেল। সে কার অভিশাপ।

চিত্তজিতের সুনীল চোখ দুটি বেয়ে টপ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু মাটিতে লুটিয়ে পড়্ল।

যাদু-স্পর্শের মতন হঠাৎ সমস্ত জীবন্ত হয়ে উঠল। কঠিন পাষাণের মূর্ত্তিগুলো নড়ে উঠল—অজগরগুলো গর্জ্জন করে উঠল। আবার সেই গান—সেই নূপুরের রব—সেই ফুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। চিত্তজিৎ ভয়ে কেঁপে উঠল। সে কোন যাদুকরের দেশে—ডাকিনীর পুরীতে এসে হাজির হল।

রাজকুমারী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে চিত্তজিতের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—"তুমি কোন পাষাণ দেশের রাজপুত্তুর দিগ্বিজয়ে বের হয়েছ?" সে ত গলায় সুর নয়—ঠিক যেন বীণার মিষ্ট আওয়াজ্।

চিত্তজিৎ বল্লে—আমি মানুষের দেশের রাজ-পুত্তুর। অদৃষ্টের ফেরে পাষাণের দেশে এসে পড়েছি, দিগ্বিজয়ে আসি নি।

রাজকুমারী বল্লেন—এটা পাষাণের দেশ নয়। তুমি পাষাণ, মানুষের সুখ-দুঃখ তোমার প্রাণে বাজে না—তাই তোমার ছোঁয়া পেয়ে সব পাষাণ হয়ে গিয়েছিল।

চিত্তজিৎ বল্লে—তারপর?

রাজকুমারী বল্লে—তারপর তোমার চোখের জলের ছোঁয়া লেগে আবার সবাই প্রাণ পেয়েছি—স্নেহ দিয়ে সব জয় করেছ!

চিত্তজিৎ ভাবছিল—স্নেহ, সে কি জিনিষ—তা দিয়ে কি করে জয় করা যায়? তবে কি ঢাল-তরোয়াল, তীর-বল্লম কিছুই নয়? সে চেয়ে দেখলে, তার কোমরে-জড়ান তরোয়ালখানা পাথর হয়ে গিয়েছে—তাতে একটুও ধার নেই।

*   *

*

রাজকুমারী ধীরে ধীরে এক ছড়া পারিজাতের মালা চিত্তজিতের গলায় পরিয়ে দিলে।

বুড়ো রাজা হঠাৎ একদিন মরে গেল। মর-বার সময় বুড়োর নাকি ভীমরতি হয়েছিল, তাই ছোট রাণীর ছেলেকে রাজ্য দিয়ে গেল, আর বড় রাণীর ছেলেকে কিচ্ছু না,—শুধু খেতে পরতে পাওয়া,—আর কিচ্ছু না।

বড়রাণী অনেকদিন আগেই মরে গিয়েছিল। রাজ্যের ন্যায্য পাওনাদার হোয়ে, বড় রাজকুমার ইন্দ্রজিতের যখন রাজ্যের ওপর কোন হাতই থাক্‌লো না তখন সে মনের দুঃখে একদিন সংসার

ছেড়ে বনে চলে গেলো—কাউকে না জানিয়ে। "সংসারে মা-বাপ কেউ নেই—বে'থা হয়নি, কিসের ভাবনা ?" ইন্দ্রজিৎ শুধু পথই চলে—পথ আর ফুরোয় না ; কোথায় যাবে তার ত' আর কিছুই ঠিক নেই। এমন কোরে সাতদিন কেটে গেল। পা আর চলে না, রাজার ছেলে, জীবনে কখনও রথ আর হাতী ছাড়া একপাও চলেনি, তার এত পরিশ্রম সইবে কেন ? পথে রাজকুমারের অসুখ হোল। তবুও হাঁটার বিরাম নেই—ইন্দ্রজিৎ ধীরে ধীরে চলেছে।

সন্ধ্যা হোয়ে এসেছে, তার ওপর—ইন্দ্রজিৎ যেখানে এসে পৌঁছুল— সে এক গভীর জঙ্গল, কপালের এমনি বিড়ম্বনা অনাহার, পথচলার শ্রান্তি, তার ওপর অসুখ শরীর, ইন্দ্রজিৎ মনের দুঃখে ভাব্‌বে—"যায় যাবে প্রাণ বাঘ ভালুকের পেটে—তা বলে আর পারিনে।"—এই বলে জঙ্গলের ভেতর একটা ফাঁকা যায়গা দেখে ইন্দ্রজিৎ গায়ের চাদর

বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে ইন্দ্রজিৎ ভাবছিল —কি ছিলাম, কি হোলাম! কোথায় সেই মখ্‌-মলের তুল্‌তুলে বিছানা,—আর কোথায় এই কাঁটা বনের ভেতরে কঠিন ভূমিশয্যা,—কোথায় ভূরি ভূরি রকমারি খাদ্য সম্ভার—আর কোথায় অনাহারে আজ সাতদিন খালিপেটে শুধু জল খেয়ে কাট্‌ছে। ভাবতে ভাবতে—ইন্দ্রজিৎ ঘুমিয়ে পড়ল, শরীর তার যথেষ্ট দুর্ব্বল হোয়ে এসেছিল।

আবার ভোর হোল, মাথার ওপরকার গাছে কাকের কাণ-ফাটানো চীৎকারে ইন্দ্রজিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসে সে অবাক হোয়ে ভাব্‌ল—একি, এখনও তাকে বাঘ ভালুকে খায়নি, এখনও সে বেঁচে রয়েছে!

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রজিৎ চারদিকটা একবার ভালোকোরে চেয়ে দেখ্‌ল;—কোথাও কিছু নেই,—কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। বনের ভেতর দিয়ে আবার ইন্দ্রজিৎ হেঁটে চলেছে, সে হাঁটে

আর গাছের দিকে কেবল চায়—যদি কোন ফলফুল পাওয়া যায়—ক্ষিধেয় তার প্রাণ কণ্ঠাগত হোয়ে এসেছে।—চেনা অচেনা একটা গাছও খুঁজে পাওয়া গেল না, এমনি কোরে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতেই সে একটা ফাঁকা যায়গায় এসে পৌঁছুল। যায়গাটা একটু ফাঁকা হোলেও চার পাশে বন দিয়ে ঘেরা তার মাঝে একটা দিঘী,—দিঘীটা পদ্মবনে ভরা। পদ্ম সব শুকিয়ে এসেছে, কয়েকটা ফুল আছে কি না আছে মাত্র! আর সব শুক্‌নো মরা পদ্ম। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তখন ইন্দ্রজিতের অবস্থা—যা পায় তাই খায়—সে ভাব্‌লে পদ্মফুলের বীচিওত খাওয়া যেতে পারে। এইনা ভেবে সে যেমনি দিঘীতে নেমেছে, অমনি একঝাঁক বুনো-হাস ঝট্‌পট্‌ কোরে উড়ে চলে গেল।

অনেক খোঁজাখুঁজি কোরেও একটি পদ্মবীচি পাওয়া গেল না, হাঁসের পাল সব উজোড় কোরে খেয়ে পালিয়েছে। এক পা কাদা মেখে কাপড়

ভিজিয়ে ইন্দ্রজিৎ হতাশ হোয়ে যেই তীরে উঠে

আসতে যাবে অমনি পেছন থেকে কার ফুঁফিয়ে

কান্নার শব্দ শুনে চমকে ইন্দ্রজিৎ ফিরে দেখলে—পদ্মবনের ভেতর একটি ফুটফুটে মেয়ে বসে বসে কাঁদছে। ইন্দ্রজিৎ অবাক হোয়ে গেল,—একি অসম্ভব! যাই হোক রাজার ছেলে, অত সহজে ভয় পাওয়ার লোক নয়, সে গম্ভীর স্বরে ডাক দিয়ে বল্লে—"তুমি কে, এই বনের ভেতর একলাটি বসে বসে কেন কাঁদছ?"

মেয়েটি কোন উত্তর দেয় না, শুধু কাঁদে আর এক একবার তার সুনীল চোখদুটি তুলে চায়। ইন্দ্রজিৎ আবার বল্লে—"বল্‌লেনা তুমি কে। যদি না বল এখুনি" এই বলে কোমরে তরওয়াল খুঁজতে গিয়ে ইন্দ্রজিতের হুঁস্ হল, সে কিছুই সঙ্গে আনেনি, শুধু এককাপড়ে রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছে!

মেয়েটা তার সুন্দর ফুট্‌ফুটে মুখ খানি তুলে বল্লে—"সে আজ কত দিন হোয়ে গেল, কতদিন পরে আজ আমি নূতন মানুষ দেখতে পেলাম, আমার কত দুঃখ, তাত তুমি জান না?"

ইন্দ্রজিতের ভারি কৌতূহল হল, এ কথা শুনে সে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কোর্‌ল—"তুমি কি বলছ, কিছুই বুঝলাম না।"

"কিছু বুঝতে পারবে না জানি, আমার দুঃখ-ত কেউ বোঝে না!"

ইন্দ্রজিৎ আশ্বাস দিয়ে বল্লে,—"তোমার কি দুঃখ আমায় খুলে বল, দেখি যদি কিছু কোর্‌তে পারি।"

মেয়েটি ধীরে ধীরে চোখ মুছে বল্লে,—"আমি ছিলাম এক রাজার মেয়ে, আমাদের যে কত কি ছিল, কি কোরে তোমাকে বলব বল, তুমিত আর কখনও রাজা রাজড়া দেখনি! যাক্‌গে মস্ত রাজার মেয়ে ছিলাম, আমার কত রূপ ছিল, রূপের গরবে আমার মাটীতে পা পড়্‌ত না। বাবার খুব আদুরে মেয়ে ছিলাম, যখন যা আব্দার ধরেছি তাই পেয়েছি তাই আমি যেখান দিয়ে হাঁটতাম সেখানে বাবার হুকুমে চুনিপান্নার পুঁতি দিয়ে সোনার তারে গাঁথা

গালচে পেতে দেওয়া হোত, দশ বারটা দাসী আমার আঁচল ধরে ধরে বেড়াত, যখন ঘুমুতাম তারা সারা রাত জেগে চন্দনকাঠের পাখা দিয়ে বাতাস কোর্‌ত, ভোরের বেলা কেউ আমার ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস পেত না। খাঁচায়-পোরা দোয়েল শ্যামা থাক্‌ত তারা ডেকে ঘুম ভাঙ্গাত; রাত্রে যতক্ষণ না ঘুম আস্‌ত ততক্ষণ দাসীরা গুণ্ গুণ্ শব্দে বীণা বাজিয়ে আমার তন্দ্রা আনবার চেষ্টা কোরত। আমাকে তারা যখন ডাকত তখন কি কর্‌তে হত জান? স্বর্গের পারিজাত ফুল এনে আমার গায়ে আস্তে আস্তে ছোঁয়াতে হোত। তাদের গলার স্বর আমার কান সইতে পারত না, তাই বাবা এই বন্দোবস্ত কোরে দিয়েছিলেন! কিন্তু—"

মেয়েটি আবার তেমনি কোরে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কোরল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে তার সুন্দর ফুটফুটে মুখ খানি টক্‌টকে লাল হোয়ে

উঠল। ইন্দ্রজিৎ অবাক হোয়ে শুনছিল সে বল্লে,
—"তারপরে ?

মেয়েটি বলতে লাগল। এবার আর সে চোখ মুছল না, সে নীরবে কাঁদে, আর বলে।—"তারপর একদিন আমার বিয়ের কথা বার্ত্তা স্বরু হোল, স্বয়ম্বর হবে। দেশে দেশে ভাট ছুটল, দেশ বিদে-শের রাজকুমারদের কাছে। বাবা বল্লেন, "তেমন ছেলে না পেলে আমি মেয়ের বিয়েই দেব না। কেমন ছেলে চাই ? না চাঁদপানা রূপ, হাতীর মতন শক্তিধর, অসুরের মতন বুকের ছাতি, সিংহের মত সাহসী।

বাবা বল্‌লেন যার তার গলায় মালা দিও না। আমি চুপ কোরে রইলাম।

ঠিক দিনে দলে দলে রাজপুত্তুররা হাজির হোল। কেউ এল তাঞ্জামে চড়ে, কেউ এল হাতী চড়ে, কেউ এল পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে, কেউ এল পুষ্পরথে উড়ে, কারু বিচিত্র সাজ শয্যা, কারু

যোদ্ধার সাজ, কারু স্বর্ণের সাজ পোষাক, সবাই বিবাহ মণ্ডপ ঘিরে বসল। বাবা সবাইকে আদর আত্তি কোরে সন্তুষ্ট কোর্‌লেন, আমার ডাক পড়ল। বাবার আদেশ পালন কোরলাম। কারুরই গলায় মালা দেওয়া হোল না,—কারণ তেমন পাত্তর কেউ আসেনি।

এই বিরাট অপমান নিঃশব্দে মাথায় তুলে নিয়ে দেশ বিদেশের রাজকুমাররা যে যার রাজ্যে ফিরে গেল, যাওয়ার সময় তারা কত অভিসম্পাতই না, দিয়ে গেল। বাবা হাসিমুখে সব সহ্য কোরলেন। আমি লজ্জায় মরে গেলাম।

কথা বলতে বলতে যেন মেয়েটির চোখদুটো ঘুমে জড়িয়ে এল, তার গলা দিয়ে আর স্বর ফুট্‌ল না, সব থেমে গেল। আস্তে আস্তে তার রূপ বদ্‌লে গিয়ে কোথায় মিশিয়ে গেল। ইন্দ্রজিৎ চম্‌কে উঠ্‌ল।

তখন সন্ধ্যা পার হোয়ে অন্ধকার হোয়ে

আস্‌ছে। ইন্দ্রজিৎ ভাব্‌ল এইখানেই রাতটা কাটিয়ে দেবে। মাঝ থেকে এ কি ব্যাপারটা হোল সে কিছুই বুঝতে পারল না। সে মেয়েটির কি আর দেখা পাওয়া যাবে না? তার সব কথা ত শোনা হোল না! সে সত্যিকারের কে, তা না জেনে সে একপা-ও নড়বেনা ঠিক কোরে দিঘীর পাড়ের একটা গাছতলায় চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। আজ আর তার ক্ষিদে তেষ্টা কিচ্ছু নেই, কেবল এই অদ্ভুত মেয়েটার কথাই ভাব্‌তে লাগ্‌ল। এক একবার তার মনে হোল হয়ত ডাইনি-টাইনি কেউ হবে, ছলকোরে আমাকে আট্‌কে রাখল যাই হোক্‌ ব্যাপারটা কি দেখা যাক্‌।

সপ্তমীর চাঁদ ঠিক কুমড়ো ফালিটির মতন বাঁকা হোয়ে ধীরে ধীরে ভেসে উঠ্‌ল আকাশের গায়,—তার ম্লান অস্পষ্ট আলো পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে যেন একটা মায়াজাল সৃষ্টি কোরেছে। এই আব্‌-ছায়া আলো-আঁধার-মেশান রাতে গভীর জঙ্গলের

ভেতর মাটীতে শুয়ে ইন্দ্রজিৎ একদৃষ্টে চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি যে ভাব্ছিল! এক একবার ফিকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আবরণে চাঁদ ঢাকা পড়ে, পৃথিবী অন্ধকার হোয়ে আসে, থম্থমে জঙ্গল আরও বীভৎস হোয়ে ওঠে, ইন্দ্রজিৎ এর এতে যেন দম্ আট্‌কে আসে, আবার মেঘ সরে যায়, চাঁদ উঁকি মারে ইন্দ্রজিতের মুখে ম্লান হাসিটুকু ফুটে ওঠে,—এমনি করে অনেকটা রাত কাট্‌ল! রাত কতখানি হোল তা জানিনা, তবে অনেকটা রাত। তবুও তার চোখে ঘুম নেই। গভীর রাতে ইন্দ্রজিৎ দেখলো আকাশ ছেয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে কে একজন যেন রাজপুত্তুর উড়ে এসে সেইখানে থাম্‌লেন। তিনি নীচে মাটিতে নাম্‌লেন না, পক্ষীরাজ ঘোড়া তার দুই বিশাল ডানা দিয়ে বাতাস কেটে তাঁকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখ্‌ল।

রাজপুত্তুর বল্লেন।—"তুমি কোথায়—এসো—"

কেউ উত্তর দিল না। আবার তেমনি কোরে

রাজপুত্তুর বল্লেন,—"ওগো তুমি কোথায়—ওগো তুমি কোথায়!"

এবারও কেউ উত্তর দিল না, শুধু আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে করুণ প্রতিধ্বনি হো'ল—"ওগো কোথায়—ওগো কোথায়?

তারপর ধীরে ধীরে রাজপুত্তুরের চোখ বেয়ে ধারা নাম্‌ল ঠিক যেন এক একটি টল্‌টলে মুক্তো; মুক্তোর পর মুক্তো ঝর্‌ল। তারপর দিঘীর উপর দিয়ে অনেকবার পক্ষীরাজ রাজপুত্তুরকে পিঠে নিয়ে উড়ে বেড়াল—রাজপুত্তুরের চোখের জল শিশির হোয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভোরের দিকে, অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে রাজপুত্তুর কাঁদতে কাঁদতে আবার আকাশের দিকে উড়ে গেল।

সূর্য্যি উঠ্‌ল। আবার সেই মেয়েটি পদ্ম বনের উপর ভেসে উঠ্‌ল, উঠে বল্‌ল—"রাত এলে আমি মরে যাই, কাল সন্ধ্যে হয়ে এল তাই সব কথা বলা হোয়ে ওঠেনি, আজ বলব, শুন্‌বে তুমি?"

ইন্দ্রজিৎ বল্লে—"শুন্‌ব তুমি বল, কিন্তু তার আগে জবাব দাও, দিন এলে তুমি মরা প্রাণ ফিরে পাও কি কোরে ?

মেয়েটির মুখ লজ্জায় টক্‌টকে লাল হোয়ে উঠ্‌ল সে মুখ নীচু কোরে বল্লে—"তাইত তোমায় বলব।"

আচ্ছা তবে বল, তুমি কি বলছিলে ?

"শোন বল্‌ছি" বলে মেয়েটি আরম্ভ কোরল—

"দেশ বিদেশের রাজকুমারেরা অপমান নিয়ে ফিরে গেল। মা কেঁদে বাবাকে বল্‌লেন "এইযে তুমি বে'টা পণ্ড কোরলে মেয়ে আমার চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌বে তা হোলে ? বাবা হেসে বল্‌লেন "তা থাক" যার তার হাতে মেয়ে আমি প্রাণ গেলেও দিতে পারব না। মা জেদ্ কোরে বল্‌লেন "চাঁদের দেশের রাজপুত্তুর তুষারের সঙ্গে আমার মেয়ের বে' যেমন কোরেই হোক আমি দেব, তুমি আর বাদ সেধো না।" বাবা বল্‌লেন "তুষারের রূপই সার,

শৌর্য্য বীর্য্য একটু খানিও নেই, ওকে আমি মরে গেলেও জামাই করব না।

মা কত কাঁদাকাটি কল্লেন, বাবার মন টল্‌ল না, বাবা বল্লেন "যার রূপে ত্রিভুবন আলো হয়, যার তেজে ত্রিভুবন ম্রিয়মান হয়, সেই মহাতেজা আদিত্যের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেব স্থির কোরেছি।

মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌লেন, যার রূপ চোখে সয়না, চোখ পুড়ে যায়, যার বিক্রমে সব্বাই ভয়ে কাঁপে এ হেন গোঁয়ার গোবিন্দ হবে কিনা জামাই! বাবা আর কোন কথা শুন্‌লেন না,—বের হোয়ে গেলেন।

মা চুপি চুপি একদিন রাত্রে পাল্কি কোরে চাঁদের রাজ্যে গিয়ে হাজির। তিনি তুষারের বুড়ী ঠাকুমাকে বিয়ের কথা দিয়েছিলেন—তাই ফিরিয়ে আন্‌তে।

বুড়ী শুধু চরকাই কাটে সারাদিন—রাজা রাজ্‌ড়া হোলে হবে কি, সেকেলে বুড়ী কিনা!

তাতে আবার বদ্ধ কালা মা বলে এলেন "এ বিয়ে হবে না।"

বুড়ী বুঝ্‌ল, মা তাগাদা দিলেন। বুড়ী বল্ল "আচ্ছা।"

* * *

তারপর একদিন আদিত্যদেব বর বেশে সাত ঘোড়ার সোণার রথে চড়ে বিয়ে কোর'তে এলেন। অপমানের প্রতিশোধ নেবে বলে কোন রাজাই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোরল না।

বিয়ে হল, ধুম ধাম যা হওয়ার কথা ছিল তার অর্দ্ধেকও হোলনা।

মা সারাদিন শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে বেড়ালেন—"আমার অমন সোনার প্রতিমা যেন মেয়ে—উগ্রচণ্ডার হাতে পড়ে এইবার মারা যাবে।"

বিয়ের পরের দিন আদিত্যদেব—আমাকে তাঁর রথে তুলে নিয়ে রওনা হোলেন,—তাঁর সাত ঘোড়ার রথ তীরের মতন ছুটে চল্লো,—এমনি সময় কোথা

থেকে তুষার তার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে উড়ে এসে ছোঁ মেরে আমায় তুলে নিয়ে পৃথিবীর দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে আদিত্যদেব অভিশাপ দিলেন। সেই অভিশাপ বর্ণে বর্ণে ফল্‌ল—তাই চাঁদের দেশ আজও মাসের অর্দ্ধেক দিন হতশ্রী হোয়ে আঁধারে ঢাকা থাকে।”

ইন্দ্রজিৎ বল্‌লে—তারপর তোমার কি হোল!

“আমার কি হোল? আমি এই পৃথিবীতে এসে ফুল হোয়ে ফুট্‌লাম। ভোরের বেলায় পূবের আকাশ আলোয় ভরিয়ে, সাত ঘোড়ার সোনার রথে চড়ে যখন আদিত্যদেব ঐ আকাশ বেয়ে উড়ে যান আমি মুখ তুলে অপলক নয়নে শুধু চেয়ে থাকি—আমার বুকের সুবাসটুকু ছড়িয়ে দিই বাতাসে মিশিয়ে—তাঁর পায়ে অর্ঘ দেবার জন্যে।”

একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ইন্দ্রজিৎ বল্‌লে—আমারও বড় দুঃখের জীবন—এস, আজ থেকে আমরা দুটীতে

ভাই্ বোন্ হোলাম, তুমি যখন দিনের বেলায় ঊর্দ্ধমুখী হোয়ে আদিত্যের তপ কোর্বে তখন আমি বীণা বাজাব তোমার পূজোর নাট-মন্দিরে বসে। তুমি যখন এমনি কোরে কেঁদে বুক ভাসাবে তখন আমি সুরের জাল বুনে তোমায় ভুলিয়ে রাখ্ব।"

* * *

* *

সেই থেকে রাজপুত্তুর ভোমরা হয়ে পদ্মবনে রোজ রোজ গুণ্ গুণ্ কোরে বীণা বাজিয়ে বেড়ায়।

মেয়েত নয় যেন স্বর্গের পরী, গরীবের ঘরে এতরূপ কেউ কখনও দেখেনি। এ যেন, গোবরে পদ্ম ফুল! ছোট্ট একটুখানি মেয়ে নাম তার বিজলী—

আপনার বলতে ত্রিসংসারে আর কেউ নেই—এক বুড়ী ঠাকৃমা ছাড়া। ঠাকৃমা বুড়ী গোবর কুড়িয়ে আনে, ঘুঁটে দেয়, বেচাকেনা করে এমনি করে তাদের দিন যায়।

বিজলী ক্রমে একটু বড় হল, ঠাকুমাও আরো বেশী বুড়ী হয়ে পড়্‌ল—চোখের ভাল দৃষ্টি নেই, কাজেই ঠাকুমার কাজ বিজলীর ঘাড়ে পড়ল। আবার দিন যায়।

এই বার গল্পের আরম্ভ

বিজলী আর একটু বড় হয়েছে।

ঠাকুমা বলে "ওলো বিজলী যা—গোবর কুড়িয়ে আন্‌; বিজলী দাওয়ায় বসে ছেঁড়া কাপড় সেলাই কর্‌তে কর্‌তে বলে "দায় পড়েছে আমার, যাব না।"

বুড়ী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে—চেঁচিয়ে বলে, আনবিনি ত, চলবে কি করে লা? বসে বসে কাঁড়ি কাঁড়ি জুটবে কি করে?

বিজলী মুখ ভেংচায় আর কথা কাটে—মুখ ভেংচায় আর কথা কাটে।

বুড়ী চ্যালা কাঠ নিয়ে থপ্‌ থপ্‌ করে মারতে আসে "দাঁড়া……তোর ভিরকুটি ভাঙ্গছি—।

"দাঁড়া......তোর ভিরকুটি ভাঙ্গছি—।

বিজলী খিল খিল করে এক গাল হেসে ছুটে পালায়, বলে—"তুমি কিছুটি বোঝনা ঠাকুমা —সব তাতেই কথায় কথায় রাগ—ছেঁড়া কাপড় নিয়ে যাই কি করে বলত ?

ঠাকুমার রাগ তাতেও পড়ে না—উত্তর দেয় —ঘুঁটে কুড়ুনীর আবার পাটরাণী হওয়ার সখ— দূর্হ—দূর্হ।"

বিজলীর হল বড্ড রাগ, সে আর একটি কথাও না বলে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়্ল— তখন বেলা বেশী হয় নি।

সারাদিন সে গোবর কুড়োয় আর সুমুখের রাস্তা ধরে পথ চলে—কোথায় সে এলো—কোথায় সে যাচ্ছে কিছুই হুঁস্ নেই—শুধু পথই চলে, ক্রমে সূর্য্যিমামা পাটে—গেলেন—পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে নিজের গাঁয়ে ফির্ল,—অন্ধকারে পথঘাট আর চেনা যায় না—একবারে রাত্রির !

বিজলীর হুঁস্ হল "তাইত ?" তার মনে পড়ল

—বাড়ী ফির্‌তে হবে ঠাক্‌মা বুড়ী পথ চেয়ে বসে আছে, ঘরে পিদ্দিম জ্বলেনি—। অথচ এ কোথায় সে এলো তাও জানে না—কোন পথ ধরে বাড়ী ফিরে যাবে তাও অন্ধকারে বোঝা যায় না—চারি পাশে শুধু মাঠের পর মাঠ, কাছে কোন গাঁ নেই যা থেকে অন্ততঃ একটু আলোও দেখা যায়।

ভয় ভাবনায় বিজলী কেঁদে ফেল্লে।

অনেকক্ষণ ধরে সে কাঁদল—বারে বারে চোখ মুছে, আবার চোখে জল টল্ টল্ করে উঠে। এমনি করে একপ্রহর গেল। শেষটায় ভাব্‌লে এই খানেই সে রাতটা কাটিয়ে দেবে, তা ছাড়াত আর কোন উপায়ও নেই।

* * *

রাত যেন আর যেতে চায় না—রাতটা যে এত-বড়, তা সে একদিনও টের পায়নি। তাই আজ তার ভাবনার অন্ত ছিলনা।

সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে আস্‌ছে, হঠাৎ তার মনে পড়ল মাটীর দেওয়াল-দেওয়া ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরটীর কথা, তার মেঝেতে খড় আর ছেঁড়া কাঁথার কত আরামের বিছানা, তারই ভেতর ঠাক্‌মায়ের গরম কোলটুকু—আবার তার চোখ জলে ভরে এল, আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। ঠিক এমনি সময় পেছন থেকে ভারী গলায় কে ডাক্‌ল—

"কে—গা ?"

একটি নিমেষ—একটি নিমেষে বিজলী সব ভুলে গেল তার দুখ, তার কষ্ট, তার ঘর, তার ঠাক্‌মা, সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌ল। পেছন ফিরে চেয়ে দেখে কেউ নেই—আবার সেই গলার আওয়াজ কাণের কাছে এসে বাজে—

"কে তুমি—কেন কাঁদ ?"

হতভম্ব হয়ে বিজলী ও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে—কাকে উত্তর দেবে ?

আবার সেই গলার স্বর—একেবারে কাণের

বিজলী ঝুড়িটা তুলে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়্‌ল—৫৪ পৃষ্ঠা

কাছে এসে বলে—বল তুমি কে, কেন কাঁদ—কি তোমার কষ্ট—?

একপা পিছু সরে গিয়ে বিজলী উত্তর দিল—আগে বল তুমি কে—কোথায় তুমি ?

সে উত্তর দেয়—এই তোমার কাছেই—দাঁড়িয়ে।

বিজলী বলে—আমি সামান্য মানুষ…

সে উত্তর দিল…মানুষ ? এত রূপ মানুষের হয় ? বিজলী বলে, এবার বল তুমি কে ?

উত্তর এল—। বল্‌ছি তা পরে, ক'টা কথার উত্তর দাও,…

এখানে এলে কি করে—কেন এলে ?

বিজ্‌লী তখন সব কথা বল্ল—একটি কথাও গোপন করল না।

সব শুনে সে অবাক হয়ে বল্লে, এত রূপ কে তোমায় দিল ?

কেন ?

হিংসে হয়। আমারও রূপ আছে, কিন্তু তাতে এমন চোখ ঝলসে যায় না।

বিজলী কিছুই ভাল বুঝতে পারছিল না, বল্লে এবার বল—তুমি কে?

সে উত্তর দিল, আমি?—আমার নাম আসমানী, এই যে দেখ রাতের আঁধার এ আমার বিরাট পাখার ছায়া, পাখার আড়ালে সমস্ত পৃথিবীটা ঢেকে রেখেছি; আমি এত বড় তাই আমার সবটা দেখতে পাওনা!

কথা শুনে অবাক হয়ে বিজলী আকাশের দিকে চেয়ে থাক্‌লো। আসমানী হেসে বল্লে—কি দেখ্‌ছ? দেখবে আমায়? হঠাৎ বেগে একটা ঝড় উঠ্‌ল,—সে হাওয়ার ঝাপ্‌টা আকাশ থেকে মাটির দিকে নেমে এলো। বিজলী দেখলে আকাশ জুড়ে যেন একটা কালো কুচ্‌কুচে পাহাড় নেমে আস্‌ছে আর তার সবটায় তারার চুম্‌কী বসান। আস্তে আস্তে সেটা একটা নারী মূর্ত্তি বলে মনে

হল। সে কাছে এসে দাঁড়াল, তার বিরাট পাখার আড়ালে বসে বিজলীর যেন দম বন্ধ হ'য়ে এল। সমস্ত দেহে তারার হার দোলান; তারা থেকে আলোর ঝর্ণা আসপাশ আলোয় রাঙ্গিয়ে তুলেছে।

বিজলী দেখলো—এমন নাক, এমন চোখ, এমন মুখ এমন চুলের বাহার, তারও ওপর লক্ষহীরের মালা—এ কোথাও সে দেখেনি—সে ভাবল এ সত্যি না স্বপন্।

ফিক্ করে একটু হেসে আস্‌মানী বল্লে "যাবে আমার দেশে?"

সে কোথায়? কোন সে দেশ!

ভয় পেয়ে বল্লে "না গো না আমি যাব না।"

আসমানী তেমনি হাসতে হাসতে বল্লে কেন যাবেনা? তোমাকে আমার ঘরের বউ করে নেব, আমার ছেলে মেঘের সঙ্গে তোমার বে' দেব। এস···বলে আসমানী টুক্ করে বিজলীকে কোলে তুলে নিয়ে আকাশের দিকে উড়ে গেল।

*　　　*　　　*

তারপর কি যে হ'ল কেউ বলতে পারেনা, শুধু মাঝে মাঝে দেখা যায়—মেঘ চীৎকার করে, বিজলী পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায় আর বিজলী তার রূপের আলো আকাশে ছড়িয়ে চারদিকে ছুটে পালায়।—তাকে ধরা দেয় না।

মেঘের দুঃখ অনেক—তাই কি সে শুধু কাঁদে ?

এক

রাজ্য শুদ্ধ লোক হাঁপাতে হাঁপাতে রাজার পায়ে এসে পড়্‌ল, "মহারাজ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।"

রাজা কইলেন—"ব্যাপার কি ?"

এরা কিছুই বলে না, শুধু চোখ কপালে তুলে হাঁপায়, আর বলে—"রক্ষা করুন,—দোহাই ধর্ম্মাবতার! নইলে প্রাণ যায়!"

বার বার এক কথায় ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গল; তিনি ধমক দিয়ে বল্লেন—"ব্যাপার কি আগে বল! নইলে করবো কি?" তখন একজন বুড়োগোছের লোক কাঁপ্তে কাঁপ্তে হাত যোড় করে বল্ল "মহারাজ, আপনার এই রাজধানী পার হয়ে—প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে পাহাড়ের তলায় ভিখুপুর বলে যে গ্রাম আছে, সেখানকার প্রজাদের ভিটামাটী উচ্ছন্ন হয়ে গেল!"

রাজা গালে হাত দিয়ে কথা শুন্‌ছিলেন,—বৃদ্ধের কথায় চম্‌কে সোজা হয়ে বসে কইলেন—"কি?"

বুড়ো লোকটা বল্‌তে লাগ্‌ল—"সত্যিই মহারাজ! আজ প্রায় মাসাবধি হ'তে প্রজাদের সুখ-শান্তি ভোজবাজীর মত উবে গিয়েছে, দিন দিন প্রজাক্ষয় হচ্ছে; যারা বেঁচে আছে, তারাও প্রাণ-ভয়ে কে কোথায় যে পালাবে, তার দিশা পাচ্ছে না।"

বৃদ্ধ কথাগুলো বলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগ্‌লো।

রাজা একবার বোধ করি মন্ত্রীর দিকে আড়-চোখে চাইলেন, তারপর সহরকোটালকে ইঙ্গিত করতেই কোটাল মশাই তীরধনু বল্লমে ঝন্‌ঝনে আওয়াজ তুলে সিংহাসনের নীচে এসে দাঁড়ালেন। মহারাজ যেই কোটালকে কিছু বল্‌তে যাবেন, ঠিক এম্‌নি সময়ে বৃদ্ধ আবার বলে উঠ্‌ল, "মহারাজ, অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন—আমার সবকথা এখনও শেষ হয় নি!"

মহারাজ আড়চোখে চেয়ে বল্লেন—"আচ্ছা, তুমি বল তোমার কথা।"

বৃদ্ধ তখন আবার বলে যেতে লাগল,—"মহা-রাজ! হয়তো মনে কচ্ছেন চোর ডাকাতের উপ-দ্রবে দেশে এই অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছে! কিন্তু মহারাজ এ মোটেই তা নয়!"

রাজা চোখ কপালে তুলে বল্লেন—"তবে কি?"

বৃদ্ধ বল্লেন—"আজ মাসখানেক ধরে প্রত্যহ সন্ধ্যার কিছু আগে হৈমশিখর পাহাড় হ'তে একজন অদ্ভুত মানুষকে নেমে আস্‌তে দেখা যায়, তার দুপায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত কাটা, দুহাতের কনুই পর্য্যন্ত নেই ; মাথার চুল জটপাকিয়ে দড়ীর মত লম্বা লম্বা হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়েছে ! মুখখানা অতি বিশ্রী কদাকার ! মহারাজ, মরা-মানুষের মুখও অমন হয় না !"

গল্প শুনতে শুনতে রাজার চোখ দুটো আম্‌ড়ার আঁটির মত বড় বড় ড্যাব্‌ডেবে হ'য়ে উঠ্‌ল, মন্ত্রী মশাই পাকাদাড়ীতে ঘন ঘন হাত বুলুতে লাগ্‌লেন, সভাপণ্ডিত ঘন ঘন নস্যি নিলেন—জ্যোতিষ পণ্ডিত শ্লেটে আঁক কেটে গুণ্‌তে বস্‌লেন—ব্যাপারটা কি ! আর সহরকোটাল, দাঁতে দাঁত পিশে, তরওয়াল খানা শক্ত করে হাতের মুঠার মধ্যে চেপে ধর্‌লেন !

গম্ভীরস্বরে রাজা কইলেন—"তারপর ?"

বৃদ্ধ বল্ল..."প্রত্যহ সন্ধ্যার ঠিক আগে সেই

লোকটা তীরবেগে পাহাড়ের সেই উঁচু হ'তে নীচের

দিকে সাঁ সাঁ ক'রে নেমে আসে। পাহাড়ের তলায় নেমেই কোথায় যেন মিলিয়ে যায়, কোথাও খুঁজে আর পাওয়াই যায় না। তারপর আবার ঠিক সেই সকালে—ঐ লোকটাকে পাহাড়ের উপরে উঠ্‌তে দেখা যায়—তেম্‌নি বিদ্যুৎবেগে! তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠে; আর সেই ঝড়ের টানে, ঘর-বাড়ী, লোক-জন গরু-বাছুর যা কিছু সম্মুখে পড়ে—সব তার সঙ্গে পাহাড়ের উপরের দিকে উল্টে পাল্টে গড়াগড়ি খেতে খেতে উঠে যায়! পরে আর তাদের কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না! ঠিক এমনি ক'রে আজ একমাস ধরে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেতে চল্ল, মহারাজ!"

সমস্ত শুনে রাজা পাথরের মতন আড়ষ্ট হ'য়ে রইলেন। শুধু সহর-কোটাল রাগ চাপ্‌তে না পেরে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন। সেই হুঙ্কারের রব রাজ-প্রাসাদের দেওয়ালের থামের গম্বুজে গম্বুজে আঘাত খেয়ে গম্‌ গম্‌ ক'রে উঠ্‌ল।

রাজা বল্লেন—"সহর কোটাল মশাই! আজ—এই দণ্ডে আসপাশ সাতখানা রাজ্যে প্রচার ক'রে দিন, যে এই অনাচারের প্রতিবিধান করতে পার্‌বে—কিম্বা ঐ অদ্ভুত জীবটার মুণ্ডু এনে দিতে পারবে—তা'কে আমি অর্দ্ধেক রাজত্ব আর আমার একমাত্র কন্যা লীলার সঙ্গে বিয়ে দেবো, সে যেই কেন হোক না—আর যে কুলেই জন্মা'ক না!"

তৎক্ষণাৎ রাজ্যে রাজ্যে দেশ-দেশান্তরে দূত ছুট্‌লো—রাজার আদেশবাণী নিয়ে।

এদিকে এ খবর শোনার পর হ'তে রাজার মনে সুখ শান্তি মোটেই রইল না! দিন দিন ভাবনায় ভাবনায় তাঁর সোনার দেহ কালিবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। রাত্রে ঘুম নেই—খাওয়া দাওয়ায় মন বসে না। মোটকথা রাজা রাজ্যের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আধমরা প্রায় হয়ে উঠ্‌লেন।

দুই

এমনি ক'রে দিন কেটে যায়। প্রত্যহই প্রজাদের কাছ থেকে মর্ম্মান্তিক আর্জ্জি, তাদের দুঃখ-কষ্টের করুণ-কাহিনী শুনে শুনে রাজা প্রায় উন্মাদ হ'য়ে উঠ্লেন। রোজ রোজ গাদা গাদা সৈন্য-সামন্ত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যায় তা'কে ধর্‌তে; কিন্তু ধরাতো দূরের কথা, তাদেরই আর ফিরে পাওয়া যায় না। পরে এমনি হ'ল যে, ভয়ে আর সৈন্য-সামন্তও এগুতে চায় না, তাদের চাক্‌রী যায়—সেও ভাল। তারপর কত সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির এল, কত ওঝা-ওস্তাদ মাথা হেঁট ক'রে ফিরে গেল, কত জ্যোতিষ-পণ্ডিতের শ্লেট পেন্‌সিল পড়ে রইল, নাঃ—কিছুতেই আর কিছু হয় না!

রাত্রে রাজার চোখে ঘুম নেই। সেদিন আষাঢ়ের এক পূর্ণিমা রাতে তিনি নিজের শোবার ঘরে পায়চারি কর্‌ছেন আর ভাবছেন "তাই-তো—এ হ'ল কি?"

ছেঁড়া মেঘের ফাঁকদিয়ে চাঁদের আলো এক ঝলক পিছলে তাঁর বিছানার উপর এসে লুটিয়ে পড়ল। রাজা অনেক দিন পরে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেখানটায় গিয়ে বস্‌লেন। অনেক খানি শ্রান্তির পর এটুকু বেশ লাগ্‌ছিলো।

এম্‌নি ক'রে বসে থাকৃতে থাকৃতে তাঁর চোখ দুটো তন্দ্রায় ঝিমিয়ে আসল্‌—মনে হ'ল যেন—অনেকখানি বুকের ব্যথা জুড়িয়ে গেল।

রাজা ঘুমুচ্ছেন ঘুমুতে ঘুমুতে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখ্‌লেন—কে একজন যেন তাঁর ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কি যেন হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে দেখ্‌ছে আর মৃদু কণ্ঠে কইছে—কোথায় সে কোথায় ?"

তন্দ্রার ঘোরে কিছুক্ষণ কাট্‌বার পর মহারাজ যেন ভাবলেন—এ নিশ্চয়ই চোর। এইবার উঠে টপ্‌ ক'রে ধরে ফেলি। কিন্তু নাঃ, তাও ত নয়। তবে কি ? যেন কে দেহের সমস্ত শক্তিটুকু চুরি করে নিয়েছে, উঠ্‌বার মোটেই শক্তি নেই, এমন কি

হাত বাড়িয়ে শিয়রের তরওয়ালখানাও নিতে পাচ্ছেন না। হঠাৎ যেন সেই অন্ধকারে কিসের এক আলো ফুটে উঠ্‌ল—আর সেই আলোতে রাজা দেখ্‌তে পেলেন—একজন সুন্দর সুশ্রী যুবক! তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মিশ্‌মিশে কালো, কাঁধের উপর লুটো-পুটি খাচ্ছে; দুধে আলতায় টকটকে রং, যেন টোকা মার্‌লে ফেটে পড়্‌বে—সুন্দর সুনীল চোখদুটী দুঃখে ম্লান হ'য়ে এসেছে, দেহে রত্নালঙ্কার ঝক্‌মক্‌ কচ্ছে, রাজা অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন—! মুখ দিয়ে হাঁ, না, কিছু বের হ'ল না, শুধু অবাক হ'য়ে অপলক-নেত্রে চেয়ে রইলেন।

যুবক রাজার দিকে ধীরে ধীরে সরে এসে দাঁড়াল।

রাজা একটা ঢোক গিলে কইলেন—"তুমি কে?"

যুবক ফিক্ করে একটু হেসে ফেলেই গম্ভীর হয়ে করুণ সুরে কইল—

"তা'ই বলব বলেই ত আমার আজ এখানে আসা, মহারাজ! আমার দুঃখের কাহিনী যা' বলি তা' শ্রবণ করুন ঃ—আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্ব্বে আমি এক শ্রেষ্ঠীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম। আমার কিছুরই অভাব ছিল না।"

এই বলে যুবক তা'র নিজের দেহের পানে একবার মাত্র চাইলে।

রাজা বল্লেন—"তারপর ?"

যুবক বল্‌তে লাগল—"মহারাজ! ধনীর ছেলে আমি চিরকাল আমোদ প্রমোদ আর বিলাসিতায় কাটিয়ে যথা সময়ে লেখাপড়া বা বিদ্যাশিক্ষার সময় আমার কোন কালেই জোটেনি। তার আগে বলে রাখি, আমি জন্মাবার ঠিক দুমাস পরেই বাবা মারা যান—তাঁর পরিবর্ত্তে যিনি অভিভাবক হ'লেন—তিনি আমার এক বৈমাত্রেয় ভাই! তিনি আমার নীতি শিক্ষা বা বিদ্যাচর্চ্চার দিকে কোন লক্ষ্যই দিলেন না; যাই হ'ক এমনি ক'রে সুখভোগের মাঝ

দিয়ে সুধু শিক্ষা পেলাম—কি ক'রে বিনা বাধায় এই জীবনটাকে আয়েসের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে হয়। লোকের দুঃখ কষ্ট গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌তাম না, ওতে আমার প্রাণে আঘাত লাগ্‌ত না। ভাবতাম, দুঃখ কষ্ট ত কেবল গরীবদের জন্যই! অহো তাদের লাঞ্ছনা দিতাম—পীড়ন ক'রতামও যথেষ্ট! নিজের মদগর্ব্বে তখন বোধ করি অন্ধ হ'য়েছিলাম!

আমার দিনগুলো এমনি বেপরোয়া খামখেয়ালী আনন্দের হাওয়ায় উড়ে চলেছিল বেশ। ঠিক এমনি সময়ে, একদিন দুপুর বেলায় নিজের বাড়ীতে ঢুক্‌তে যাব, বাইরের দেউড়ীতে পা দিতেই দেখি এক সন্ন্যাসী অতিথি এসে হাজির হ'য়েছে! সন্ন্যাসীকে দেখে হঠাৎ আমি রাগে জ্বলে উঠ্‌লাম,—এদের আমি দু-চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তাম না। তা ছাড়া ভাবলাম আমার বাড়ীটা কি ধর্ম্মশালা, না সরাইখানা যে নিত্য-নূতন এই অশান্তি! রাগের মাথায় হাতের বহুমূল্য ছড়িখানা দিয়ে পথ দেখিয়ে বল্লাম,—

'ভিক্ষুক এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও।'

আমার একথায় সন্ন্যাসী ব্যথা-ভরা চোখ দুটী তুলে বল্ল—'অন্য কিছু চাই নি আমি শুধু একটু রাত্রির বিশ্রাম!'

চীৎকার ক'রে বল্লাম—'কিছুতেই নয়—দূর হও।'

সন্ন্যাসী বলল—'মাত্র এক রাত্রি—' হাতের সাম্‌নে যা পেলাম তাই দিয়ে প্রহার করে যাচ্ছি—কীল চড় লাথি, গালাগালি, কিছুই বাদ গেল না।"

মহারাজ তন্ময় হয়ে শুন্‌ছিলেন—বললেন "তারপরে?"

"তারপরে?—মহারাজ! তারপরে অনেক বিরাট দুঃখের সমুদ্র! সে যা'ক্, সন্ন্যাসী আমার কাছ হ'তে ছাড়া পেয়ে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল ই হাসি দেখে থ' হোয়ে গেলাম। ক্রমে সেই হাসি য়া

মুখ প্রশান্ত হ'ল, ক্রমে গম্ভীর ; শেষে মুখখানা রাগের আগুনে গন্ গন্ করে যেন জ্বলে উঠ্‌ল।

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সন্ন্যাসী অভিসম্পাত দিয়ে গেলেন—'রে মূর্খ, যদি আমি সত্যই তপশ্চারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হই, তবে এই অভিশাপ দিয়ে গেলাম, যেমন তুই ভগবানের দেওয়া এই হাত পায়ের অপব্যবহার ক'র্‌লি, মৃত্যুর পর তোর আত্মা —হাত-পা না-থাকা এক জড়পিণ্ডে পরিণত হবে। তোমার আজকের অহঙ্কার দেড় হাজার বছর ধরে তিলে তিলে পুড়ে খাঁটী হয়ে আস্‌বে। বীভৎস চেহারা নিয়ে তোর বাস হবে পৃথিবীর সব্ চাইতে কদর্য্য স্থানে, আহার হবে—সংসারের যা কিছু আব-র্জ্জনা অখাদ্য ! এমনি ক'রে গ্রহের পর গ্রহে ঘুরে ঘুরে সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছর পরে এই পৃথিবীতে ফিরে আসবি—তোর মুক্তি হবে—সেই দিন যেই দিন লোককে ভালবাসতে পারবি, আর সেই ঠিক আড়াই হাজার বছরের শেষ দিনটায় পূর্ণিমা রাতে

কোন এক রাজবালার পায়ের নূপুর মাথায় তুলে নিবি !”

বিরাট শ্লেষের হাসি হেসে বলে উঠলাম—“উন্মাদ ভিক্ষুক ! এর মানে ?' সন্ন্যাসী বল্‌ল-—'এর মানে—পুরুষ হয়েও সেদিন রমণীর তুচ্ছ পায়ের নপুরটাকেও আনন্দে মাথায় তুলে নিবি। এইটুকু তার শেষ প্রায়শ্চিত্ত !'

একথা শুনে রেগে সন্ন্যাসীকে ধর্‌তে গেলাম। সন্ন্যাসী অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এর সাতদিন পরে আমার মৃত্যু হ'ল ; সন্ন্যাসীর কথা অক্ষরে—অক্ষরে ফলে গেল—এই মৃত্যুর পরে। সেই আড়াই হাজার বছর ধরে যে অশেষ যন্ত্রণায় তিলে তিলে জ্বলে পুড়ে মর্‌ছি—, তা'ত কেউ বুঝবে না। মহারাজ ! আমি কত রাজ্য ছারখারে দিচ্ছি—সে কি অদ্ভুত ক্ষিদের জ্বালায় !

* * *

আজ সেই দিন এসেছে। আজ আমার মুক্তির

ধব্‌ধবে পা দুলিয়ে .....হাত তালি দিয়ে নাচ্‌ছে।—৭৯ পৃষ্ঠা
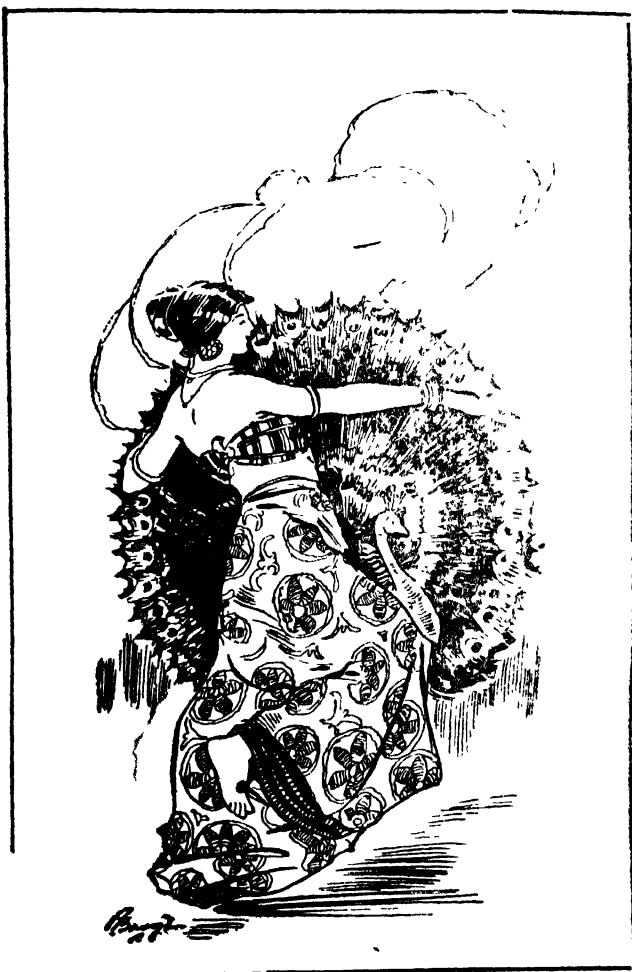
দিন, কোথায় কোথায় কোন্ রাজবালা গো—
কোথায় তোমার নূপুর ?

সেই সুন্দর যুবক যেন নূপুরের খোঁজে ঘরটা হাত্‌ড়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। ক্রমে ক্রমে সেই স্বর মিলিয়ে গেল ঘরের পর ঘর পার হয়ে—চত্তরের পর চত্তর পার হ'য়ে।

অনেক বেলায় রাজার ঘুম ভাঙ্গতেই, রাজা ধড়্‌ফড় করে উঠে বস্‌লেন—প্রথমেই তাঁর মনে পড়ল—রাত্রির সেই স্বপনের কথা, তারপর মনে পড়ল নিজের রাজ্যের দুর্দ্দশার কথা—আর সেই অদ্ভুত পঙ্গু !

রাজা টপ্‌ ক'রে নীচে বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়িয়েই ছুটে চল্লেন—কি মনে করে তাঁর মেয়ের খোঁজে। অনেক দিন পরে তার মুখে যেন আবার হাসির আভাস দেখা দিল। "লীলা—লীলা—।" সমস্ত প্রাসাদ তোলপাড় কোরে রাজা মেয়ের সন্ধান না পেয়ে ছুটে চল্লেন—রাজ-উদ্যানে।

সে দিন সকাল হ'তেই দিনটা বেশ মেঘ্‌লা করে এসেছে, ঘন রাশি রাশি কালো জমাট মেঘ দিগন্ত অন্ধকার ক'রে ভেসে যাচ্ছিল।

রাজকুমারী লীলা তার ধব্‌ধবে দুখানি পা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত কৌশলে একটা প্যাখম-মেলা ময়ুরের সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে দিয়ে নাচ্‌ছিল।

হঠাৎ মহারাজকে সামনে দেখ্‌তে পেয়েই ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরে অভিমানের সুরে বলল—"বাবা, আজকে আমি নিজে হার মেনেছি ময়ূরের কাছে!"

আদরে বুকে চেপে ধরে মহারাজ বল্লেন—'কেন মা?'

লীলা বলল—"আমার সোনার নূপুর চুরি হ'য়ে গেছে—খালি পায়ে কি নাচ হয়?" সত্যিইত এতক্ষণ রাজার নূপুরের কথাই মনে ছিল না, বুঝ্‌তে পারলেন স্বপনটা মিথ্যা নয়। সে কথা চেপে গিয়ে

তিনি হাসিমুখে বললেন "তা'তে কি! এবার হীরের মটর দিয়ে সোনার নূপুর গড়িয়ে দেবা!"

তারপর থেকে রাজ্যের উৎপাত থেমে গিয়েছে। পঙ্গুর আর সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রাম-ঘাট-মাঠ-বাড়ীঘর আবার যেমন তেমনি লোকজনে ভরে উঠেছে, যেন কোথাও কিছুই হয়নি।